—এটিতে **লৌকিক** ব্যাপারের উপর **ব্যাকরণশাস্ত্রের ব্যবহার** আরোপিত হয়েছে। উক্তিটি দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের।

(xx) "পীতবাস বড় **তাপিত,** দেখিলাম **উদর স্ফীত**—
উদরী সন্দেহ তাতে নাই।
হয় বা বঁধুর প্রাণদণ্ড, পথ্য তাতে **মানখণ্ড**
ব্যবস্থা হয়েছে ওগো রাই॥
আছে যেন প্রস্তুত ঘরে, শীঘ্র **মান** চূর্ণ ক'রে
অগ্রে দাও···।" —দাশরথি।

—এখানে **লৌকিকের** উপর **আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ব্যবহার** আরোপিত হয়েছে। মানিনী রাধার প্রতি সখীর উক্তি। রাধার দুর্জ্জয় মানের ফলে দুঃসহ বিরহতাপে তপ্ত কৃষ্ণ, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে তাঁর পেট উঠছে ফুলে ফুলে; অবস্থা শোচনীয়, কৃষ্ণ বাঁচেন কিনা সন্দেহ। রাধা মান বর্জ্জন করলেই কিন্তু সব ঠিক হ'য়ে যায়। সখী রাধাকে এই কথাই বলছেন।

লক্ষণীয় যে 'মান' আর 'মানখণ্ড' কথাদুটিতে রয়েছে শব্দশ্লেষ আর রয়েছে 'তাপিত' আর 'উদরী'তে। জ্বরযুক্ত উদরীরোগে আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবস্থা 'মানখণ্ড' (সত্যই একটা ওষুধের নাম); কৃষ্ণপক্ষে, বিরহতাপ আর দীর্ঘশ্বাসে উদর-স্ফীতিরও প্রতীকারের উপায় 'মানখণ্ড' অর্থাৎ রাধাকর্ত্তৃক আপন মানের খণ্ডন (বর্জ্জন)।

এইবার একটি অতিসুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি সংস্কৃত থেকে—

(xxi) 'নয়ন-সীমার বাহিরে তাহার বাসা,
পরশিতে তারে পারেনি কখনো ভাষা,
উপমান তার কিছু নাই এ নিখিলে,
অর্থে তাহার আভাসও কভু না মিলে,
প্রমাণবিহীন সংবিৎ-ঘন নিত্যানন্দময়
পরম সত্তা—তরুণীর তনুলাবণ্য জয় জয়!' —শ. চ.

('অলঙ্কারসর্ব্বস্ব'র "সীমানং ন জগাম যৎ নয়নয়োঃ·····লাবণ্যং জয়তি প্রমাণরহিতং চেতশ্চমৎকারকম্॥" কবিতার অনুবাদ।)

—এখানে **লৌকিক বস্তুর** ('তরুণীর তনুলাবণ্য') উপর **বেদান্তের ব্যবহার** আরোপিত: **'নয়ন' থেকে 'সত্তা' পর্য্যন্ত ব্রহ্মস্বরূপকথা।**

সংস্কৃতে আর দুটি প্রকারভেদ আছে—শাস্ত্রীয় বস্তুর উপর শাস্ত্রীয় বস্তুর

ব্যবহার-আরোপ আর শাস্ত্রীয় বস্তুর উপর লৌকিক বস্তুর ব্যবহার-আরোপ। বাঙলায় এটি নিষ্প্রয়োজন—অনেক অনুসন্ধান ক'রেও উদাহরণ পেলাম না।

আগে বলেছি, 'ব্যবহার' কথাটার অর্থ শুধু 'আচরণ' 'স্বভাব' ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার নিদর্শন দেখা গেল (খ) শ্রেণীর উদাহরণগুলিতে। **শাস্ত্রীয় বস্তুর ব্যবহার-আরোপ মানে, প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রীয় পরিভাষার** (technicalities) **আরোপ**। এই শ্রেণীর সমাসোক্তির Personification বা Pathetic Fallacy-র সঙ্গে কোনো মিল নাই। কিন্তু (ক) শ্রেণীর সমাসোক্তির পাশ্চাত্ত্য Figure-দুটির সঙ্গে সর্ব্বাংশে না হ'লেও বহুলাংশে মিল রয়েছে। Pathetic Fallacy-র সংজ্ঞা হ'ল attribution of human emotion to inanimate objects (অপ্রাণীর উপর মানবীয় অনুভবের আরোপ)। আমাদের (ক) শ্রেণীর (xvi) আর (xviii) উদাহরণদুটির ("কার এত দিব্যজ্ঞান…" আর "সুন্দরী…") প্রথমটিতে নারীর উপর inanimate লতার ব্যবহার এবং দ্বিতীয়টিতে আধুনিক মানুষের উপর পৌরাণিক মানুষের অলৌকিক ব্যবহার আরোপিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যমতে এটি Metaphor-এর উদাহরণ।

'Pathetic Fallacy' নামটা Ruskin-এর সৃষ্টি—সত্যকথা বলতে গেলে **অপসৃষ্টি**। ভাবাবেগে কবিদের যখন "reason is unhinged" তখন ঝাপ্‌সা চোখে তারা প্রকৃতির রাজ্যে যা কিছু দেখে সব 'false' অর্থাৎ fallacious। এইহেতু Ruskin এর নাম দিলেন Pathetic **Fallacy**। 'Reason'-কে 'hinged' রাখলে Art হয় না, Arithmetic হয়।

এই Pathetic Fallacy-জাতীয় সমাসোক্তিই রবীন্দ্রনাথের বহু অত্যুৎকৃষ্ট কবিতার আত্মা—'বলাকা'র কবিতা, বৃক্ষবন্দনা ইত্যাদি ইত্যাদি স্মরণীয়।

১৩। *অতিশয়োক্তি*

উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তিতে। সাধারণ ধর্ম্মের ভিত্তিতে দুই বিজাতীয় বস্তুর সজাতীয় হ'য়ে ওঠা উপমাজাতীয় সকল অলঙ্কারেরই সাধারণ লক্ষণ। সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কার উপমায় যাত্রা আরম্ভ ক'রে চলতে থাকে অতিশয়োক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে—ওইখানেই তার যাত্রাসিদ্ধি। দুই বিজাতীয় বস্তুর সজাতীয়তাসাধনের অর্থ বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রতিষ্ঠা। এই সাদৃশ্যের নামান্তর সাম্য, সাধর্ম্ম্য, ঔপম্য। সাম্য-প্রতিষ্ঠা করা যায় নানাভাবে—

একপ্রান্তে আংশিক, অন্যপ্রান্তে সম্পূর্ণ, মাঝখানের স্তরগুলি প্রান্তিক বৈশিষ্ট্য-দুটির নানানতর যোগে বিভাগে আলোছায়ায় বিচিত্র। সাম্যপ্রতিষ্ঠার এই প্রকারভেদে অলঙ্কারের নামভেদ। জাতিতে এক হ'লেও ব্যক্তিরূপে এরা উপমা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহ্নুতি, অতিশয়োক্তি (এবং আরও কত কি)।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি কবিতা থেকে পূর্ণোপমার একটি উদাহরণ নিয়ে তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং প্রয়োজনমতো রূপান্তরিত ক'রে সাম্যপ্রতিষ্ঠার কয়েকটি প্রকারভেদ দেখাতে চেষ্টা করি :

(i) **পূর্ণোপমা**—"দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত।"

—রৌদ্র আর ঝিঁঝিপোকার পাখনা দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। এই বিভিন্নতা বজায় রেখে মাত্র ক্রিয়াগত সাধারণ ধর্ম্ম 'কাঁপিছে'-র ভিত্তিতে বস্তুদুটি যথাক্রমে উপমেয়-উপমানরূপে অভিন্ন হ'য়ে গেছে। আপন স্বাতন্ত্র্য কেউ হারায় নাই, যেহেতু চোখ পড়ছে দুটিরই উপর, এবং সমানভাবে। অভিন্ন অথচ ভিন্ন উপমেয় উপমান—ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হওয়া দুটি পরীক্ষার্থীর মতন। এ যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য ভেদাভেদের দ্বৈতাদ্বৈত। উপমেয় উপমানে ভেদ এবং অভেদ দুইই তুল্যমূল্য ("**সাধর্ম্ম্যম্** উপমা **ভেদে**"—মম্মট; "দ্বয়োঃ (ভেদাভেদয়োঃ) তুল্যত্বম্"—রুয্যক)।

(i) **ব্যতিরেক**—'দূরে বালুচরে রোদ কাঁপে থর' থর',
ঝিঁঝির পাখার চেয়ে সে তীব্রতর।'

—উপমান ঝিঁঝির পাখা কম্পনধর্ম্মে হার মেনেছে উপমেয় রৌদ্রের কাছে। রয়েছে দুটিই; কিন্তু দৃষ্টিটা বেশী ক'রে আকর্ষণ করছে 'রোদ'। কম্পনধর্ম্ম দুপক্ষে থাকা সত্ত্বেও তার তারতম্য ঘটায় উপমেয় উৎকৃষ্ট, উপমান নিকৃষ্ট হ'য়ে ভেদটাকেই বড়ো ক'রে তুলেছে। ব্যতিরেক ভেদপ্রধান অলঙ্কার।

(iii) **রূপক**—'দূরে বালুচরে কাঁপে থর'থরে **রৌদ্র-ঝিল্লীপাখা।**'

—আগে বলেছি যে কম্পন-ক্রিয়াটি উপমেয় উপমানের সাধারণ ধর্ম্ম। আলোচ্যমান রূপটিতে 'কাঁপে' আকারে সে বর্ত্তমান রয়েছে। এই কারণে 'রৌদ্র-ঝিল্লীপাখা'-কে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস বললে ভুল হবে—এ সমাসে সাধারণ ধর্ম্মের ('সামান্যে'র) প্রয়োগ নিষিদ্ধ ("উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে"—পাণিনি)। **সমাস এখানে রূপক কর্ম্মধারয়, যাতে সাধারণ ধর্ম্ম হয় উপমানের অনুগত—'কাঁপে' রৌদ্র নয়, ঝিল্লীপাখা।** এই কথাটি মূল্যবান্। রৌদ্রের উপর ঝিল্লীপাখা অভেদে আরোপিত হওয়ায় উপমেয় রৌদ্র নিষ্ক্রিয়, উপমান ঝিল্লীপাখা সক্রিয়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় হ'লেও

রৌদ্রের অস্তিত্ব-লোপ ঘটে নাই, ঝিল্লীপাখার আড়ালে তাকে দেখা যাচ্ছে। অভেদ তাই পরিপূর্ণ হ'তে পারে নাই। এই কারণেই বলা হয় **রূপক অভেদ-প্রধান অলঙ্কার, অভেদ-সর্ব্বস্ব নয়।**

(iv) **অপহ্নুতি**—'দূরে বালুচরে রৌদ্র নয় সে, কাঁপিছে ঝিঁঝির পাখা।'

—উপমেয় রৌদ্রকে অস্বীকার ক'রে একেবারে নেপথ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং মঞ্চে উজ্জ্বলভাবে দাঁড় করানো হয়েছে উপমান ঝিঁঝির পাখাকে। এখানেও রূপকের মতন অভেদ-আরোপ; পার্থক্য শুধু এই যে ভেদটাকে অসম্ভব ক'রে তোলা হয়েছে উপমেয়কে অস্বীকারের দ্বারা, যা রূপকে হয় না। এই কারণে অভেদের মাত্রাটা রূপকের চেয়ে বেশী। কিন্তু অস্বীকৃত বস্তুর নামোল্লেখের মধ্যেই কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি প্রচ্ছন্ন থাকে; বস্তুটি গৌণ হ'য়ে যায়, মিথ্যা হয় না।

অভেদ সম্পূর্ণ হয় তখনই, যখন উপমান উপমেয়কে গ্রাস ক'রে নিঃশেষে আত্মসাৎ ক'রে ফেলে। এই গ্রাসের আলঙ্কারিক নাম 'নিগরণ'। এ কাজ সুসিদ্ধ করে—

(v) **অতিশয়োক্তি**—'রোশেখা দুপুরে দূরে বালুচরে কাঁপিছে
ঝিঁঝির পাখা।'

—অভেদ সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে উপমান ঝিঁঝির পাখা উপমেয়কে উদরসাৎ ক'রে স্বয়ং একমেব অদ্বিতীয়ম্ হ'য়ে ওঠায়।

পূর্ণোপমার স্বাভাবিক চরম বিবর্ত্ত রূপ অতিশয়োক্তি, প্রথমেই এই কথা ব'লে বর্ত্তমান আলোচনা আরম্ভ করেছি। এখন তা প্রতিপন্ন হ'য়ে গেল। দেখলাম, যে-অভেদ উপমায় ছিল আংশিক, অতিশয়োক্তিতে সে হ'ল পূর্ণ।

একটা প্রশ্ন এখানে অনিবার্য্যভাবে জেগে ওঠে:

সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারে বড়ো কে? উপমেয়? না, উপমান? রূপক অপহ্নুতি ইত্যাদিতে প্রাধান্য লাভ করতে করতে এসে উপমান অতিশয়োক্তিতে হ'য়ে উঠল উপমেয়-গ্রাসী। তবে কি উপমানের আসন উপমেয়ের উর্দ্ধে? উপমেয় 'প্রকৃত'—কবির মূল বর্ণনীয় বিষয়, অপরিহার্য্য। উপমান 'অপ্রকৃত', শুধু অলঙ্করণেই তার প্রয়োজনীয়তা, অন্যথায় সে অনাবশ্যক। উপমেয় মুখ্য, উপমান গৌণ। গৌণ এসে মুখ্যকে গ্রাস করবে, অপ্রকৃত করবে প্রকৃতের উচ্ছেদ, কবির অভীপ্সা এই নাকি?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু **বড়ো উপমেয়,** উপমান নয়। উপমান উপমেয়কে যতই আপন বর্ণানুরঞ্জনে স্ব-রূপে রূপায়িত করুক, তাকে

অপহ্নব ক'রে পিছনে ঠেলে দিয়ে স্বয়ং সামনে এসে দাঁড়াক, অথবা তাকে নিঃশেষে গ্রাস ক'রে নিজে নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুক, তবু উপমেয়েরই আজ্ঞাবহ উপমান; যতই নিজস্ব মহিমা এই উপমানের থাকুক না কেন, এ হ'ল প্রবরনৃপ এবং এর সিদ্ধি হ'ল আপন মুকুটমণির মরীচিচয়ে সার্ব্বভৌম উপমেয়ের চরণ চর্চ্চিত করায়। উপমানের স্থান উপমেয়ের পদ-তলে, "লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন"।

উপমানের চরম মহিমা অতিশয়োক্তিতে—উপমেয়ের এখানে সর্ব্বগ্রাস। কিন্তু 'গ্রাস' মানে উপমেয়ের অস্তিত্বলোপ নয়, তাকে অপ্রকাশ রেখে ব্যঞ্জনায় তারই স্ফুটতর প্রকাশসাধন। রৌদ্রের নামগন্ধ না ক'রে ঝিঁঝির পাখাকে যতই কাঁপাই না কেন, দ্রুতকম্পিত স্বচ্ছপাখায় বোশেখী দুপুরে বালুচরে মরীচিকার আশ্চর্য্যসুন্দর স্বপ্নমোহময় ঝিলিমিলিই দেখতে পাই মানসনয়নে। সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারমাত্রেই উপমেয়েরই প্রাধান্য। **সৌন্দর্য্যের দিক্ থেকে উপমেয়ের অনন্ত সম্ভাবনা। চোখকে** ধরা যাক **উদাহরণ**স্বরূপে। চোখের গড়ন, বিস্তার, সাদা অংশ, কালো তারা, পাতা, তার প্রান্তের রোম, ভুরু, টানা চোখ, ভাসা-ভাসা চোখ, ফালা চোখ, সোজা বাঁকা আধবাঁকা চাহনি, তারাকে একেবারে কোণায় ঠেলে দেওয়া চাহনি, তার ওপর প্রসন্ন বিষণ্ণ, স্থির, চঞ্চল, হাসিমাখা, জলভরা, স্নিগ্ধ, জ্বালাময় শান্ত ক্লান্ত রুষ্ট তুষ্ট পলে পলে নূতন ভঙ্গীর চাহনি—এই তো চোখের সামান্য একটু পরিচয়। এমন উপমান স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে কোথাও নাই যা চোখের পাশে এসে দাঁড়াবে সর্ব্বাংশে তার সমধর্ম্মা হ'য়ে। চোখ তার আপন মহিমার এক একটি অণুকণাকে উজ্জ্বল ক'রে দেখাবার জন্য ডাকবে সম্ভবকে, যাকেই সে যোগ্য ব'লে ভাববে—পদ্মের পাপড়ি, হরিণ, খঞ্জন, তোমরা, আগুন, বর্ষা, আলো, অন্ধকার, কেসর, বিদ্যুৎ, চাঁদের কিরণ, কেউটে সাপ, ধনুক, অমৃত, বিষ, ছুরি, বাণ, লতা, অরুণ, কামান ("কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় **কামানের** প্রয়োজন নাই"—বঙ্কিমচন্দ্র), জবা, পটোল ইত্যাদি। এত সব উপমান এসেও যার অন্ত পায় না, সেই উপমেয়ের চেয়ে উপমান বড়ো হ'য়ে যাবে একি সম্ভব? 'উপমেয় যেখানে উপমানের চেয়ে নিকৃষ্ট হ'য়ে যায়, সেখানেও হয় **ব্যতিরেক** অলঙ্কার', বলেছেন রুদ্রট। মম্মটভট্ট বলছেন, কি অসঙ্গত কথা! 'ব্যতিরেক' মানে আধিক্য (প্রাধান্য, উৎকর্ষ) এবং এ আধিক্য উপমেয়ের [("উপমেয়স্য ব্যতিরেকঃ আধিক্যম্।...উপমানস্য উপমেয়াৎ আধিক্যম্ ইতি কেনচিৎ যৎ উক্তম্, তৎ অযুক্তম্")। গোবিন্দঠাকুর তাঁর কাব্যপ্রদীপে বলছেন, উপমানের উৎকর্ষে ব্যতিরেক হয় এই যে কথাটা